২

গবেষণা সমস্যার নির্বাচন ও সূত্রবদ্ধকরণ

Selection and Formulation of a Research Problem

একজন গবেষক গবেষণার শুরুতেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হন, সেটি হলো "গবেষণার বিষয়বস্তু কি হবে"? এ প্রশ্নের উত্তরটি সহজ নয়। কারণ, মানব আচরণের সব কিছুকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করা যায়। কিন্তু সে সকল বিষয়বস্তু থেকে গবেষক তার গবেষণার জন্য কোন সমস্যাটিকে বেছে নিবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। সেটি হতে পারে, কোন সমাজবৈজ্ঞানিক আদর্শ রূপ, গবেষকের মূল্যবোধ ও পছন্দ, উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়ার মাত্রা, গবেষণা পদ্ধতি, সময়কাল, অর্থ, জনবল, বা গবেষণার প্রকৃতি। এত কিছু বিবেচনার পরও হয়তো গবেষক কেবল কতগুলো গবেষণা প্রসঙ্গ নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন। সেই নির্বাচিত গবেষণা প্রসঙ্গগুলোকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তর করতে হবে। অর্থাৎ, সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করতে হবে এবং বিদ্যমান তত্ত্ব ও গবেষণা পর্যালোচনার পর সমস্যাটির পর্যাপ্ত বর্ণনা করে গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। এ সকল বিষয়বস্তু এই ইউনিটের আলোচ্যসূচীতে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন
- পাঠ - ২ : সুনির্দিষ্ট সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণ
- পাঠ - ৩ : সমস্যার বর্ণনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য

পাঠ - ১

গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন
Selecting a Topic for Research

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- গবেষণার বিষয়বস্তু কীভাবে নির্বাচিত হয়
- গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
- গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাস্তবায়নযোগ্যতার গুরুত্ব

গবেষণার বিষয়বস্তু কীভাবে নির্বাচিত হয় (How a Research is Topic Selected)?

'গবেষণার জন্য সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কি হতে পারে'? এই প্রশ্নের জবাবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষের আচরণ যত ব্যাপকতা নিয়ে বিস্তৃত এবং মানুষের আচরণকে যা কিছু প্রভাবিত করে, তার সবকিছুই গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। যদি আমরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের উপর গবেষণা করতে চাই, তাহলেও দেখা যাবে যে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। যেমন, গোষ্ঠীগুলো একে অপরের প্রতি কিভাবে আচরণ করে? একে অপরের সম্পর্কে কি ভাবে বা অনুভব করে? ঐতিহ্য, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিটি গোষ্ঠী কতটুকু ভিন্ন? তারা কিভাবে বেড়ে উঠে? শিশুদের প্রতি তারা কি আচরণ করে? তাদের জীবন যাত্রার প্রণালী পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে? ইত্যাদি।

যে কোন সামাজিক সমস্যাকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন, বেকারত্ব, জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র, আন্তর্জাতিক সংঘাত, পরিবেশ দূষণ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নারী নির্যাতন, ইত্যাদি। মানুষের যে কোন আচরণকেও গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন, সহিংস আচরণ, রক্ষণশীল মনোভাব, অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক আচরণ, অপরাধ প্রবণতা, ইত্যাদি। যে কোন তত্ত্ব বা তত্ত্বের অংশও গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। যেমন, সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব, মনোবিশ্লেষণের তত্ত্ব, বিবর্তনের তত্ত্ব, সামাজিকীকরণ তত্ত্ব, শিক্ষণ তত্ত্ব, ইত্যাদি। এ সব বিষয়বস্তু কখনো কোন সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য পরিচালিত হয়, কখনো এগুলো তত্ত্ব বিকাশের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো গবেষণা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সমস্যাকে নির্বাচন করা হয়, আবার কখনো যুগপৎভাবে একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়।

গবেষণার বিষয়বস্তু কখনো কোন সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য পরিচালিত হয়, কখনো এগুলো তত্ত্ব বিকাশের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো গবেষণা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সমস্যাকে নির্বাচন করা হয়, আবার কখনো যুগপৎভাবে একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়।

এ ছাড়া, যে কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের সাধারণ কৌতূহল থেকেও গবেষণার বিষয়বস্তুর উদ্ভব হতে পারে। সেটি হতে পারে কোন পর্যবেক্ষণ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, কোন সরকারী কর্মসূচী, পারিবারিক সিদ্ধান্ত, বা কোন বিষয় সম্পর্কে অনুমান, ইত্যাদি। গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে এমন কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

একটি পর্যবেক্ষণ:

'একটি পরীক্ষায় কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।'

এ রকম একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে চট্ করে মনের মধ্যে কতগুলো প্রশ্ন জাগতে পারে। যেমন, কেন একজন ছাত্র/ছাত্রী অন্যের চেয়ে বেশী নম্বর পায়? কোন ধরণের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী নম্বর পায়? কিভাবে পায়? ইত্যাদি।

পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত:

'মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানোর বিষয়ে করিম সাহেব এবং তার স্ত্রী দু'জনে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, তারা তাদের মেয়েকে ইংরেজী মাধ্যমে, না কি বাংলা মাধ্যমে পড়াবেন।'

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হতে পারে, তা হলো: দু'টি মাধ্যমে পড়ার মধ্যে ভাষা ছাড়া অন্য কোন তফাৎ আছে কি? সন্তানের সামাজিকীকরণে এর কোন প্রভাব পড়বে কি? পেশা নির্বাচনে দু'টি মাধ্যম কোন পার্থক্যমূলক প্রভাব ফেলবে কি? ইত্যাদি।

একটি সংবাদ প্রতিবেদন:

'গত বছরের তুলনায় এবছর অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কি মাত্রায় অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে? কেন বৃদ্ধি পেয়েছে? কোন ধরণের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে? কোন শ্রেণীর মানুষ বেশী অপরাধ করছে? ইত্যাদি।

একটি সরকারী কর্মসূচী:

'সরকার চলতি অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা প্রবর্তন করার বিষয় বিবেচনা করছে।'

সরকারী এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের কথা ভাবলে মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো এসে ভীড় করে, সেগুলো হলো: দেশে কি পরিমাণ বয়স্ক মানুষ রয়েছে? বয়স্ক মানুষদের সার্বিক অবস্থাটি কেমন? মাথা পিছু ভাতার পরিমাণ কি হবে? এর ফলে বার্ষিক বাজেটে কতটুকু বরাদ্দ নির্ধারিত হবে? বরাদ্দকৃত বাড়তি অর্থ কোথা থেকে আসবে? ইত্যাদি।

গবেষণার জন্য যদি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে গবেষকের জন্য অন্য কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেয়, নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে, গবেষককে নিজেকেই গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়। সাধারণতঃ, গবেষকের মনে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা বা ধারণাগুচ্ছ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কি বিষয়ের উপর তিনি গবেষণা করবেন। কিন্তু গবেষক সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সেই বিষয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর কি কি গবেষণা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে এবং সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে গবেষকের যে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক। গবেষকের ধারণা থেকে অন্যদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে, বিপরীতমুখী হতে পারে, এমনকি বিষয়টির উপর গবেষণা করলে রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যাতে করে গবেষক গবেষণার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, শুরুতে যতটা সহজ মনে হয়, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ কাজ নয়।

তাহলে একজন গবেষক কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন যে, তিনি কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করবেন? গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলে এমন উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে সিদ্ধান্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। তবে কোন বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক নিজের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে পারেন।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (Factors Affecting the Selection of a Research Topic)

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। তবে কোন বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক নিজের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে পারেন। যেমন,

- নির্বাচিত সমস্যাটি কি গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
- এই গবেষণা কি কোন পার্থক্য তৈরি করবে?

- কেন করবে?
- কীভাবে করবে?
- গবেষণাটি কী কৌতূহলোদ্দীপক হবে?
- এটি কি এমন কোন ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যার ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে?
- প্রচলিত ধ্যান ধারণার মধ্যেকার অসঙ্গতিগুলো কী এই গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে?
- এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রচলিত সামাজিক রীতি ও অনুশীলন পরিবর্তনে সহায়ক হবে কি?
- এই গবেষণা কী গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে কোন নতুন অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধির জন্ম দেবে? ইত্যাদি।

উপরিল্লিখিত প্রশ্নগুলো পর্যালোচনার পর একজন গবেষক তার নিজের আগ্রহ, বা সবচেয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য অনুকল্প কি হবে, তার বিবেচনা, বা সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করলে বিষয়বস্তুর উপর বিদ্যমান জ্ঞানকে অর্থবহভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করবে কি না, বা সে বিষয়টি জ্ঞানের জগতে কোন অভিনব অবদান রাখবে কি না, এসবের ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনটি হয়ে থাকে সম্ভবতঃ অনুসন্ধানকারীর বাস্তবায়নের ক্ষমতার উপর। যা হোক, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে, যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু উপাদানের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলো হলো:

সমাজবৈজ্ঞানিক আদর্শ রূপ (Sociological Paradigm): সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক রকম আদর্শ বা মতবাদ রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির মূল্যবোধ, পদ্ধতি, পরিধি, প্রকৃতি এবং আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কের সুস্পষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। এ সব আদর্শ বা মতবাদ গবেষণা সমস্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে গবেষকের নিজস্ব পছন্দ ও রুচিবোধ বিরাট ভূমিকা রাখে।

গবেষকের নিজস্ব মূল্যবোধ, পছন্দ ও রুচিবোধ (Researcher's Personal Values, Tastes and Preferences): গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে গবেষকের নিজস্ব পছন্দ ও রুচিবোধ বিরাট ভূমিকা রাখে। যেমন, অনেক গবেষক রয়েছেন যারা গবেষণার সূক্ষ্মতা ও বিশুদ্ধতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা মনে করেন যে, প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম উপাত্ত সংগ্রহের চেয়ে পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ উপাত্ত সংগ্রহ অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। গবেষকের মূল্যবোধ শুধু যে বিষয়বস্তু নির্বাচনকেই প্রভাবিত করে তাই নয়, কি পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালিত হবে এবং গবেষক নিজের সাথে গবেষণার বিষয়বস্তুর সম্পর্কটিকে কিভাবে দেখবেন তাও নির্ধারিত হয়।

প্রতিক্রিয়ার মাত্রা (Degree of Reactivity): উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে সহজাত প্রতিক্রিয়ার মাত্রা গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বলতে একটি গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি উপাত্তকে কিভাবে এবং কতটুকু প্রভাবিত করে সেই বিষয়টিকে বোঝায়। যাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়, তারা পর্যবেক্ষণকারীর উপস্থিতিতে এক ধরণের আচরণ করেন এবং অনুপস্থিতিতে আরেক ধরণের আচরণ করেন। অতএব, একটি বিশেষ গোষ্ঠী কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, সেটি বিবেচনা করে গবেষক সিদ্ধান্ত নেবেন যে, তার গবেষণার প্রসঙ্গটি কি হবে এবং গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিটি কি হবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology): গবেষণায় অনুমিত অনুকল্প পরীক্ষার জন্য কি ধরণের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে, বা আদৌ কোন অনুকল্প পরীক্ষিত হবে কি না, বা কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হবে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের সাথে গবেষণার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, কোন গবেষক হয়তো সহ-সম্পর্কের সহগ নির্ণয় করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত

গবেষণায় অনুমিত অনুকল্প পরীক্ষার জন্য কি ধরণের প্রমাণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে, আদৌ কোন অনুকল্প পরীক্ষিত হবে কি না, বা কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হবে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের সাথে গবেষণার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

তাৎপর্য মাত্রায় সেই সম্পর্কটিকে প্রমাণ করতে চান, আবার অন্যজন সাদামাটা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শুধুমাত্র আচরণের বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইবেন। গবেষণার বিষয়বস্তু কি হবে, তা নির্ভর করবে এই সব সিদ্ধান্তের উপর।

বিশ্লেষণের একক (Unit of Analysis): বিশ্লেষণের একক যদি ছোট হয় (যেমন, একজন ব্যক্তি), সে ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু এক রকম হতে পারে, আবার যদি বিশ্লেষণের একক বড় হয় (যেমন, একটি প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়), তবে তার বিষয়বস্তু নির্বাচন ভিন্ন হতে পারে।

সময়কাল (Time): গবেষণা যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয় (cross sectional), তবে বিষয়বস্তুর নির্বাচন এক রকম হবে, এবং যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় (longitudinal), তবে বিষয়বস্তুর নির্বাচন ভিন্ন রকম হতে পারে।

গবেষণার প্রকৃতি (Nature of the Research): গবেষণাটি কি তত্ত্বীয় ধরণের, না কি প্রায়োগিক ধরণের হবে তার উপর নির্ভর করবে গবেষণার বিষয়বস্তু কি হবে।

গবেষক কি বিষয়ে গবেষণা করবেন তা নির্ধারণের জন্য সম্মান ও অর্থ অনেক ক্ষমতাশালী উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

সম্মান ও অর্থ (Prestige and Money): গবেষক কি বিষয়ে গবেষণা করবেন তা নির্ধারণের জন্য সম্মান ও অর্থ অনেক ক্ষমতাশালী উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা অনেক বেশী সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তি ঘটিয়ে থাকে। যেমন, সর্দি জ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারের পরিবর্তে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সংযোজন সংক্রান্ত গবেষণা অনেক বেশী সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তি ঘটিয়ে যাকে। সেই অর্থপ্রাপ্তি ব্যক্তিগত আয় বা গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহ উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে।

গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাস্তবায়নযোগ্যতার গুরুত্ব (Importance of Feasibility in Selecting a Topic for Research)

গবেষণার জন্য একটি বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণাটি বাস্তবায়ন করা যাবে কি না, সেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উপরিল্লিখিত সব উপাদানের বিচারে হয়তো একটি প্রসঙ্গকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করা হলো। কিন্তু দেখা গেল যে, বিষয়টি গবেষণার জন্য বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা গবেষণা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে, গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে কতগুলো সাধারণ বিষয় রয়েছে, সেগুলোর আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সমস্যার পরিধি, সময়, অর্থ, অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা, যথাযথ নমুনা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, ঝামেলা এড়ানো, বিষয়বস্তুর সংশোধন বা পরিবর্তন করা, ইত্যাদি। বিষয়গুলো নিম্নে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

অনেক বেশী চলকসম্পন্ন বিষয়বস্তুর নির্বাচন গবেষণাকে অবাস্তবায়নযোগ্য করে তোলে।

সমস্যার পরিধি (Scope of the Problem): অধিকাংশ শিক্ষানবিশ গবেষক অনেক বেশী চলক নিয়ে অনেক বড় বিষয়বস্তুকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন। অনেক বেশী চলকসম্পন্ন বিষয়বস্তুর নির্বাচন গবেষণাকে অবাস্তবায়নযোগ্য করে তোলে। আমরা পাঠ ২-এ দেখবো যে, একটি বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যার জন্য বহু রকম গবেষণা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু গবেষক এর একটি বা দু'টি প্রশ্ন নিয়েই কেবল তার গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে পারেন। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের কোন প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে হলে, যত কম চলকের মাধ্যমে ব্যাখ্যাটি করা যায়, সেই ব্যাখ্যাটি ততবেশী সূক্ষ্মতা অর্জন করবে। অতএব, যেহেতু একটি বিষয়ের সব প্রসঙ্গকে একটি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সেহেতু গবেষণায় কি কি চলক অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার সীমারেখা টানতে হবে। একটি গবেষণায় কতগুলো প্রসঙ্গ নির্বাচন করা যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম বেঁধে দেয়া না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, যদি বিষয়বস্তুটি জটিল হয়, তবে একটি বা দু'টির বেশী প্রসঙ্গ একটি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা বাস্তবসম্মত হবে না। গবেষককে এমন কিছু প্রসঙ্গকে বেছে নিতে হবে, যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

সময় (Time): একটি গবেষণা বাস্তবায়ন করার জন্য সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়, গবেষণা শেষ করতে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। গবেষণার জন্য এমন কোন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা ঠিক হবে না, যা নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যাবে না। অতএব, বিষয়বস্তু নির্বাচনের পূর্বে গবেষককে খুব ভালোভাবে ভাবতে হবে যে, গবেষণা কর্মটি সময়মত শেষ করা যাবে কি না। তা করতে গিয়ে যথাযথ নমুনা নির্বাচনে উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং গবেষণা প্রতিবেদন লিখতে কত সময় লাগবে, এ সকল বিষয়ে গবেষককে বিবেচনা করতে হবে।

গবেষণার জন্য এমন কোন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যাবে না, যা নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যাবে না।

অর্থ (Money): সময়ের মত অর্থও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নির্ধারিত সময়ে গবেষণা সম্পন্ন করতে না পারলে ব্যয় বেড়ে যাবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলে গবেষণা বাস্তবায়ন করা যাবে না। উপরন্তু, এমন কোন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা ঠিক হবে না, যাতে করে গবেষণা সম্পন্ন করতে গিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়, বা দাতা গোষ্ঠী বা পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। পাশাপাশি, গবেষণা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি সম্ভাব্য উপাদান হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। গবেষণা বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকেও পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন, নির্বাচিত নমুনাগুলো যদি বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই একটি নমুনা থেকে আরেকটি নমুনায় যেতে যাতায়াত খরচ বেশী প্রয়োজন হবে। যদি কোন নমুনা সংগ্রহে নমুনা তালিকা তৈরি করতে হয়, সেটিও হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ে গবেষণা সম্পন্ন করতে না পারলে ব্যয় বেড়ে যাবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলে গবেষণা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

অন্যান্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা (Cooperation from Others): এ পর্যন্ত আলোচনায় মনে হতে পারে যে, একটি সহজ সরল গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, যথেষ্ট সময় এবং অর্থ প্রাপ্তি ঘটলেই বোধ হয় একটি গবেষণার বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টিকে এত সরলভাবে দেখলে হবে না। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে, গবেষণার সাথে অন্যান্য যে সব ব্যক্তি সম্পৃক্ত থাকেন তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন, গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু প্রসঙ্গ থাকতে পারে, যেগুলো সম্পর্কে উত্তরদাতারা তথ্য সরবরাহ করতে রাজী নাও হতে পারেন। পরীক্ষণমূলক গবেষণায় যাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হবে, তাদের সম্মতির প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণা কর্ম শুরু করতে দিয়ে দেখা গেল যে, তাদের সম্মতি পাওয়া যাচ্ছে না। সাক্ষাৎকারের জন্য অনেক বেশী সময় প্রয়োজন হলে, উত্তরদাতারা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সহযোগিতা নাও করতে পারেন। কাজেই, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, নইলে গবেষণা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

যথাযথ নমুনা পাওয়া (Availability of Reseach Subjects): শুধু উত্তরদাতাদের সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়। একটি বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে গবেষণা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। নমুনায় প্রয়োজনীয় অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন, বা বাড়িতে থাকলেও গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে চান না। এমন কি, সংখ্যালঘু অনেক সম্প্রদায়ের সদস্য রয়েছেন, যারা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে চান না। এ ধরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নমুনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা পরিকল্পনা করলে অনেক সময় গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

একটি বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে গবেষণা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

ঝামেলা এড়ানো (Avoidance of Trouble): অনেক অনভিজ্ঞ গবেষক নিজের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের ফলে এমন একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, যা গবেষণার মাঝ পথে বা শেষ প্রান্তে গিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে, গবেষক তার কর্মকান্ড স্থগিত করে পরিকল্পিত গবেষণাকে বর্জন করতে বাধ্য হতে পারেন। সে জন্য গবেষণা পরিকল্পনার সময় নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সব প্রসঙ্গগুলোকে পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে, তার কৌশল ও বিকল্প কৌশলও নির্ধারণ করতে হবে।

গবেষণা পরিকল্পনার সময় নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সব প্রসঙ্গগুলোকে পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে তার কৌশল ও বিকল্প কৌশলও নির্ধারণ করতে হবে।

সংশোধন বা বর্জনের সিদ্ধান্ত (Decision to Abandon or Revision): গবেষণা প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে যদি দেখা যায় যে, গবেষণাটি যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, ঠিক সেভাবে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে গবেষক কি করবেন? অনেকে মনে করতে পারেন যে, গবেষণা কর্মটি বর্জন করা উচিৎ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেটি করাই হয়তো সমীচীন হবে। তবে, তার পূর্বে সম্ভাব্য সকল সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে, কোনভাবে পরিকল্পনাকে সংশোধন করে গবেষণা কর্মটিকে সম্পন্ন করা যায় কি না। যেমন, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু কিছু বেসরকারী স্কুলে এমন নীতিমালা থাকতে পারে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর স্কুলের বাইরের কারো গবেষণা করার অনুমতি নেই। সে ক্ষেত্রে, গবেষণা কর্মটিকে বর্জন করার পূর্বে যেখানে এমন প্রতিবন্ধকতা নেই, এমন সরকারী বা অন্য বেসরকারী স্কুল দ্বারা সেই স্কুলগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা যায় কি না, এই সম্ভাবনাটিকে খতিয়ে দেখতে হবে।

সারাংশ

যে কোন সামাজিক সমস্যা সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন গবেষকের ধারণায় অনেক কিছুই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যে সব বিষয় সমস্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে, সেগুলো হচ্ছে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, অর্থ, স্থান, কাল, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলতে গেলে, গবেষক যখন কোন সমস্যা নির্বাচন করতে যান, তখন উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো গবেষণার ধরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান পাঠে সমস্যা নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, যেমন, বিষয়বস্তু কিভাবে নির্বাচিত হবে, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কি কি, তা আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে:

ক. জনসংখ্যা সমস্যাকে নির্বাচন করা যেতে পারে
খ. দারিদ্রকে নির্বাচন করা যেতে পারে
গ. যে কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্বাচন করা যেতে পারে
ঘ. নারী নির্যাতনকে নির্বাচন করা যেতে পারে।

২। গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে:

ক. গবেষকের ইচ্ছা
খ. গবেষকের আর্থিক সঙ্গতি
গ. গবেষকের কাছে রক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা
ঘ. গবেষকের বাস্তবায়নের ক্ষমতা।

৩। গবেষক কি বিষয়ের উপর গবেষণা করবেন, তা নির্ধারণের জন্য _____ অনেক বিষয় উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

ক. সম্মান ও জ্ঞান
খ. সম্মান ও অর্থ
গ. সম্মান ও শিক্ষা
ঘ. সম্মান ও ডিগ্রী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা সমস্যা নির্বাচনে সময়ের গুরুত্ব কতটুকু?

২। যথাযথ নমুনা নির্ধারণের পূর্বশর্ত কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। গবেষণা সমস্যা নির্ধারণে গবেষককে কোন কোন বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হয়, তা আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

সুনির্দিষ্ট সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণ
Formulation of a Specific Problem

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- গবেষণাযোগ্য সমস্যা কী
- গবেষণা প্রসঙ্গ থেকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া

গবেষণাযোগ্য সমস্যা কী (What is a Researchable Problem)?

একটি গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর পরই গবেষক ভাবতে পারেন যে, তিনি কি উপাত্ত সংগ্রহ করবেন? কি পদ্ধতিতে তা সংগ্রহ করবেন এবং কিভাবে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করবেন? এবং এ সব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি কি প্রস্তুত? কিন্তু কার্যতঃ, তা ঠিক নয়। এ সব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যাটিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গবেষণার যোগ্য করে তুলবে হবে। অর্থাৎ, সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করতে হবে, যাতে করে তা পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশ্লেষণের যুক্তিকে লঙ্ঘন করে অনেকে সমস্যা নির্বাচনের পরপরই উপাত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে, হয় গবেষক উপাত্ত সংগ্রহের পর তার গবেষণা সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণ করবেন, নতুবা তিনি কোন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাই করবেন না। প্রথমটি বিজ্ঞানসম্মত গবষণার যুক্তিতে একটি অনৈতিক কাজ এবং দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা নয়।

গবেষণার সমস্যা নির্বাচন থেকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি নতুন গবেষকদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন করে তোলে। এমন কি, অভিজ্ঞ গবেষকরাও এই প্রক্রিয়াটিকে খুব একটা সুখকর বলে মনে করেন না। একটি গবেষণার সাধারণ বিষয়বস্তুকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ, বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়গুলোকে এমনভাবে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে, যাতে করে যে কেউ বুঝতে পারেন যে, গবেষণার প্রশ্নটি কি হবে? দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যয়গুলোকে এমন হতে হবে যে, সেগুলোকে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করানো যাবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ বা পরোক্ষ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা যাবে। চতুর্থতঃ, এই কর্মকান্ডগুলোকে বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ, গবেষণা প্রসঙ্গ থেকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি হলো, একইসাথে প্রত্যয়ের ক্রমবর্দ্ধমান সুতীক্ষ্মকরণ এবং বিষয়বস্তুর পরিধির ক্রমবর্দ্ধমান সংকীর্ণকরণ।

গবেষণা প্রসঙ্গ থেকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া (Process of Transforming a Research Topic to a Researchable Problem)

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত একটি গবেষণা প্রসঙ্গ প্রায়োগিক গবেষণার জন্য অস্পষ্ট ও দিক নির্দেশনাহীন একটি বন্ধ বাক্সের মত। গবেষণা সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট, সুতীক্ষ্ম ও দিকনির্দেশনামূলক করে তুলতে হলে সেই বন্ধ বাক্সটিকে উন্মোচিত করে প্রসঙ্গটির সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত একটি গবেষণা প্রসঙ্গ প্রায়োগিক গবেষণার জন্য অস্পষ্ট ও দিক নির্দেশনাহীন একটি বন্ধ বাক্সের মত। গবেষণা সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট, সুতীক্ষ্ম ও দিকনির্দেশনামূলক করে তুলতে হলে সেই বন্ধ বাক্সটিকে উন্মোচিত করে প্রসঙ্গটির সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। আমরা তখনই কেবল প্রসঙ্গগুলোর ভিত্তিতে আমাদের মনোনিবেশকে গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণের কাজে লাগাতে পারবো। একটি অস্পষ্ট ও দিকনির্দেশনাহীন সমস্যার বন্ধ বাক্সটিকে উন্মোচিত করার জন্য যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা যেতে পারে, সেগুলো হলো:

- গবেষণার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রত্যয়গুলো কি?
- প্রত্যয়গুলোর সম্পর্কের মধ্যে কি ঘটছে?

- গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রধান প্রসঙ্গগুলো কি?
- প্রসঙ্গগুলোর একটি বিষয় কি অন্য বিষয়কে প্রভাবিত করছে, বা অন্য বিষয়ে পরিবর্তন আনছে?
- যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে কেন তা ঘটছে?
- সেই পরিবর্তনগুলো কিভাবে ঘটছে? ইত্যাদি।

এই সব প্রশ্নের উত্তর গবেষকের আগ্রহের প্রসঙ্গগুলোকে আলাদা করতে সাহায্য করবে। পাঠ ১-এ দেয়া 'পর্যবেক্ষণ'-এর উদাহরণটির ভিত্তিতে আমরা সমস্যাটির স্পষ্টতা ও সুতীক্ষ্ণকরণের বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। পর্যবেক্ষণটি ছিলো 'একটি পরীক্ষায় কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে'। যদি আমরা প্রশ্ন তুলি যে, 'কেন কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী নম্বর পেল'? এর উত্তরে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোকে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

- কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী মেধাবী।
- কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী পড়াশোনা করেছে।
- কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী পুষ্টিকর খাবার খেয়েছে।
- কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় পড়াশোনাকে বেশী উপভোগ করেছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষক আরো অতিরিক্ত কিছু ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন। যেমন,

- কিছু ছাত্র-ছাত্রী গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়েছে।
- কিছু ছাত্র-ছাত্রীর পিতা-মাতা অন্যদের তুলনায় বেশী সম্পদশালী।
- কিছু ছাত্র-ছাত্রীর পিতা-মাতা অন্যদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত।
- কিছু শিক্ষক অন্যদের তুলনায় কিছু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

একজন গবেষক নির্বাচিত গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোকে যখন আলাদা করতে সক্ষম হন, তখন বোঝা যায় যে, তিনি গবেষণা সমস্যাটিকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে উন্মোচিত করতে পেরেছেন। 'কেন কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী নম্বর পায়?' – এ প্রশ্নের আটটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করাতে পেরেছেন। গবেষক এর মধ্য থেকে মাত্র একটি ব্যাখ্যাকে নির্বাচন করে গবেষণা সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করে তুলতে পারেন। অন্যান্য উপাদানগুলো যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, গবেষকের অল্প সংখ্যক উপাদানের উপর নিজেকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।

একজন গবেষক নির্বাচিত গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোকে যখন আলাদা করতে সক্ষম হন, তখন বোঝা যায় যে, তিনি গবেষণা সমস্যাটিকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে উন্মোচিত করতে পেরেছেন।

এই সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোকে প্রশ্নের আকারে রূপান্তরিত করলে, প্রতিটি প্রশ্ন একেকটি গবেষণা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্য থেকে গবেষক যে কোন একটি বা দু'টি প্রশ্নকে নিয়ে গবেষণা প্রকল্প রচনা করতে পারেন। যেমন,

- মেধা কি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর প্রাপ্তিতে কোন প্রভাব ফেলে?
- প্রতিদিনের অধ্যয়নে অধিক সময় ব্যয় করলে কি ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় বেশী নম্বর পায়?
- পুষ্টিকর খাবার বেশী খেলে কি ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে সাহায্য করে?
- পড়াশোনা বেশী উপভোগ করলে কি ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় বেশী নম্বর পায়?
- গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়লে কি ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে সাহায্য করে?
- সম্পদের প্রাচুর্যের সাথে কি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক নম্বর পাবার সম্পর্ক রয়েছে?
- পিতামাতার শিক্ষার সাথে কি ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে?
- শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্বমূলক যত্ন কি কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বেশী নম্বর পেতে সাহায্য করে?

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, একজন গবেষক তার গবেষণার প্রসঙ্গ হিসাবে সহিংসতাকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, সহিংস আচরণের বিষয়টি বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণায় অবতীর্ণ হতে হলে, প্রসঙ্গটিকে উন্মোচিত করে প্রথমে এর পরিধিকে সুনির্দিষ্ট করে আনতে হবে। সহিংসতার বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, ধর্মীয় সহিংসতা, সাংস্কৃতিক সহিংসতা, জাতিসত্ত্বাভিত্তিক সহিংসতা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, সাধারণ সহিসংতা, ইত্যাদি। ধরা যাক, গবেষক লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে গবেষণা করবেন বলে ঠিক করলেন। এতে মনে হতে পারে যে, গবেষক তার বিষয়বস্তুর পরিধিকে সুনির্দিষ্ট করে ফেলেছেন। কিছুটা সুনির্দিষ্ট করা গেলেও পরিধির সুনির্দিষ্টকরণ পুরোপুরি হয়নি। কারণ, সহিংসতাকে আরেক মাত্রায় বিভক্ত করা যায়। যেমন, গবেষক কি দৈহিক সহিংসতা, না কি মৌখিক সহিংসতা নিয়ে গবেষণা করতে চান? কেন না, একেকটি প্রকারভেদের ভিত্তিতে একেক রকম গবেষণা প্রশ্ন তৈরি হবে, একেক রকম গবেষণা নক্শা তৈরি হবে, একেক রকম নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে, একেক রকম উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারিত হবে এবং একেক রকম উপাত্ত বিশ্লেষণের কৌশল নির্ধারিত হবে।

ধরা যাক, গবেষক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার দৈহিক মাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে চান। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পরিধিকে আরো সুনির্দিষ্ট করে সুতীক্ষ্ম করা যায়। তবে ধরে নেয়া যাক যে, আমাদের কল্পিত গবেষক তার বিষয়বস্তুকে মোটামুটিভাবে সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। এতে করে গবেষণা প্রসঙ্গ থেকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তরের কেবলমাত্র একটি কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি এখনও বাকী রয়েছে। সেটি হলো, গবেষণা প্রসঙ্গটিকে উন্মোচিত করে প্রত্যয়গুলোকে সুতীক্ষ্ম করার মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নগুলোকে নির্ধারণ করা। অতএব, গবেষণা প্রসঙ্গটিকে পর্যবেক্ষণযোগ্য গবেষণার লক্ষ্যে ক্ষুরধার করে তোলার জন্য যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা যায়, সেগুলো হলো:

- সহিংসতার প্রকৃতি কী?
- সহিংসতার প্রকারভেদগুলো কী?
- সহিংসতা কেন ঘটে?
- সহিংসতা কী একটি সাধারণ নৈমিত্তিক ঘটনা?
- সমাজে সহিংসতা কী মাত্রায় বিদ্যমান?
- কোন বিশেষ অবস্থা কী সহিংসতাকে উৎসাহিত করে?
- সহিংসতা কীভাবে ঘটছে?

উদাহরণ অনুযায়ী আমরা জানি যে, আমাদের কল্পিত গবেষক তার গবেষণার জন্য লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে বেছে নিয়েছেন। 'কেন লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা ঘটে'? এর ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে,

- কিছু মানুষ জন্মগতভাবে সহিংস।
- কম শিক্ষিত মানুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার ঘটনা বেশী ঘটে।
- নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার ঘটনা বেশী ঘটে।
- নিম্ন পেশার মানুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার ঘটনা বেশী ঘটে।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা জড়িত।
- স্বাতন্ত্রবোধ বৃদ্ধির কারণে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা বেশী ঘটে।
- পরিবারে সামাজিকীকরণের সমস্যা থাকলে লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার ঘটনা বেশী ঘটে।
- বসবাসের পরিবেশের সাথে সহিংসতা জড়িত।

লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার এই সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে গবেষণা প্রশ্নের আকারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যার যে কোন একটি বা দু'টি প্রশ্নকে নিয়ে গবেষক তার গবেষণা প্রকল্প তৈরি করতে পারেন।

- কিছু মানুষ কী অন্য মানুষের তুলনায় জন্মগতভাবে বেশী সহিংস?
- শিক্ষা কী লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে প্রভাবিত করে?
- আয় কী লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে প্রভাবিত করে?
- পেশা কী লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে প্রভাবিত করে?
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে প্রভাবিত করে?
- মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে কি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়?
- সামাজিকীকরণের সমস্যা থাকলে কি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়?
- সামাজিকীকরণের সমস্যা থাকলে কি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়?
- বসবাসের পরিবেশ কি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতাকে প্রভাবিত করে?

কিন্তু কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এতক্ষণ তো গবেষক নিজের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে সমস্যাটিকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই জ্ঞান কি প্রত্যয়গুলোকে যথাযথভাবে সুতীক্ষ্ম করে তোলা ও বিষয়বস্তুর পরিধিকে সুনির্দিষ্ট করে তোলার জন্য যথেষ্ট? যে সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে, সেই পর্যবেক্ষণটি কি একটি সাধারণ নিয়ম, না কি কেবলই একটি দৈব ঘটনা? এই প্রশ্নগুলোকে কিছুটা নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। কীভাবে তা সম্ভব? এই নিরীক্ষার জন্য দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো, বিভিন্ন পরিবেশে গিয়ে গবেষণার প্রসঙ্গগুলোকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে যে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রসঙ্গটি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাগুলো দাঁড় করানো হয়েছে, সেগুলো সত্যি সত্যিই গবেষণাযোগ্য কি না। দ্বিতীয়টি হলো, প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও অন্য গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করা এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা।

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় কিছু ছাত্র-ছাত্রীর বেশী নম্বর পাওয়ার পর্যবেক্ষণটির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে যে, সত্যি সত্যিই কিছু ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশী নম্বর পেয়েছে কি না। তারপর তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিসহ অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার ক্ষেত্রে, যে সব ব্যাখ্যা বা গবেষণা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো সত্যি সত্যিই ঘটে কি না তা দেখার জন্য কোন একটি বিশেষ এলাকায় গিয়ে সেই ধরণের ব্যক্তি বা পরিবারগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। প্রথম বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কিছুটা সহজ হলেও দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তা বেশ কঠিন। কারণ, বিষয়টি এত সংবেদনশীল যে, কোন ব্যক্তি সহজে স্বীকার করতে চাইবেন না যে, তিনি লিঙ্গভিত্তিক দৈহিক সহিংসতার সাথে জড়িত। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, হাসপাতাল, সালিশ কেন্দ্র, ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটিও শ্রমসাধ, জটিল এবং বেশ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। উপরন্তু, এটি অপেক্ষাকৃতভাবে একটি অকার্যকর পদ্ধতি। কারণ, অনেক সময় দেখা যাবে যে, একটি বিশেষ এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশিত কোন ঘটনাই ঘটে নি, বা ঘটলেও তা হয়তো সমস্যার প্রকৃত রূপকে প্রতিফলিত করে না। ফলে, এ ধরণের পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা থেকে গবেষণা সমস্যার ভুল সংজ্ঞা, প্রস্তাবনা ও দিক নির্দেশনা তৈরি হতে পারে।

এ ধরণের পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসরণ করাই বেশী যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকর। সেটি হলো, গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও অন্য গবেষকের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা কর্মের সযত্ন পর্যালোচনা। গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পর্যালোচনা বিষয়বস্তুটিকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি হিসাবে কার্যকর

করে তোলে এবং গবেষণা সমস্যাটিকে সুসংবদ্ধভাবে ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ম করে তোলে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর কোন তত্ত্ব নেই, বা কোন গবেষণা কর্ম পূর্বে পরিচালিত হয়নি। সে ক্ষেত্রে, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, বিষয়বস্তুর উপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে গবেষণার বিষয়বস্তুকে পৌনঃপুনিকভাবে ধারালো করে তোলাই হলো সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

সারাংশ

একজন গবেষষকে গবেষণা প্রসঙ্গ নির্বাচনের পরে যে কাজটি নিষ্ঠার সাথে করতে হয়, সেটি হলো প্রসঙ্গটিকে সমস্যায় রূপান্তর করা। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে একটি প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে গবেষণা সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। বস্তুত, পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গবেষককে যে বিষয়গুলোর উপর নজর রাখতে হয়, তা হলো প্রশ্ন সৃষ্টির প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, প্রসঙ্গটিকে গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা। যদি সুস্পষ্টভাবে প্রশ্ন সৃষ্টি করা যায়, তখনই গবেষক প্রশ্নের আলোকে তথ্য সংগ্রহের নীতিমালা নির্ধারণ করবেন। আর এই প্রক্রিয়ায়, একটি যথাযথ গবেষণা পরিচালিত হলে গবেষক সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। গবেষণা প্রশ্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে _____ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

ক. গবেষণার সময়
খ. গবেষণার প্রকারভেদ
গ. গবেষকের অভিজ্ঞতা
ঘ. গবেষণার স্থান।

২। গবেষণা সমস্যাকে গবেষণাযোগ্য করে তোলার পূর্বশর্ত হচ্ছে:

ক. গবেষণার সাথে অর্থ উৎসের সম্মিলন ঘটানো
খ. গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোকে আলাদা করতে পারা
গ. গবেষণার স্থান, কাল, পাত্র ঠিক করতে পারা
ঘ. গবেষণার স্থান নির্ধারণ করা।

৩। সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রশ্ন নিরীক্ষার অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে:

ক. বিভিন্ন পরিবেশে গবেষণার প্রসঙ্গগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা
খ. বিভিন্ন পরিবেশে গবেষণার নমুনাকে নির্ধারণ করা
গ. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ধাপগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা সমস্যা কী?

২। গবেষণাযোগ্য সমস্যা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণা সমস্যা কী? গবেষণা সমস্যার রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।

২। গবেষণাযোগ্য সমস্যার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

সমস্যার বর্ণনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য
Statement of the Problem and Objectives of Research

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সমস্যার সংজ্ঞা ও যৌক্তিকতা
- সমস্যার বর্ণনা কিভাবে লিখতে হবে
- সমস্যার উপর বিদ্যমান তত্ত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানের পর্যালোচনা
- গবেষণার উদ্দেশ্য

সমস্যার সংজ্ঞা ও যৌক্তিকতা (Definition and Rationalization of the Problem)

গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান ও যৌক্তিকতা প্রমাণের ক্ষেত্রে, প্রথমে সমস্যাটি কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, তার বর্ণনা করতে হবে। যদিও এ প্রসঙ্গে আমরা পাঠ ১ এবং পাঠ ২-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, সমস্যার বর্ণনায় সেটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেহেতু একটি সমস্যা ছাড়া গবেষণা হলো অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়ে ফেরার শামিল, সেহেতু বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো একটি গবেষণা সমস্যাকে চিহ্নিত করা। কিন্তু আমরা জানি যে, একটি গবেষণাকে চিহ্নিতকরণের কাজটি যত সহজ বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ততটা সহজ নয়। কখনো কখনো একটি সমস্যাকে বেছে নেয়ার কাজটি সমস্যাটি সমাধানের চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সমাজে বহু সমস্যা রয়েছে, কিন্তু সব সমস্যাই গবেষণাযোগ্য নয়।

একটি সমস্যাকে তখনই গবেষণাযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে, যখন সেটি তিনটি শর্ত পূরণ করবে। *প্রথমতঃ*, বিদ্যমান জ্ঞান এবং প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। *দ্বিতীয়তঃ*, এই পার্থক্য কেন বিদ্যমান, সে বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করা যায়। *তৃতীয়তঃ*, সেই প্রশ্নটির কমপক্ষে দু'টি সম্ভাব্য ও ব্যাখ্যাযোগ্য উত্তর দেয়া যায়। তৃতীয় শর্তটি সম্পর্কে বলা যায় যে, সম্ভাব্য ও ব্যাখ্যাযোগ্য উত্তর দু'টির মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কে গবেষকের দ্বিধা বা সন্দেহ থাকতে হবে। যদি প্রশ্নটির কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য ও ব্যাখ্যযোগ্য উত্তর থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই এবং সেটিকে গবেষণাযোগ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

গবেষকের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিবেচনাবোধের দ্বারা কোন সমস্যার সাধারণ প্রসঙ্গের নির্বাচনটি পরিচালিত হয়।

গবেষকের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিবেচনাবোধের দ্বারা কোন সমস্যার সাধারণ প্রসঙ্গের নির্বাচনটি পরিচালিত হয়। এই পছন্দের ক্ষেত্রে, গবেষকের মূল্যবোধ একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ যে সব বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয়, সে সকল সমস্যা গবেষণার প্রসঙ্গ হিসাবে নির্বাচিত হতে পারে। পেশাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুহল থেকেও অনেক সময় গবেষণার প্রেষণা তৈরি হয়। যখন গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু নতুন ফলাফল গবেষকের তাত্ত্বিক প্রত্যাশার সাথে মেলে না, তখন নিজের ভিতরেও এক ধরণের যন্ত্রণা হতে থাকে, যার ফলাফল হিসাবে তিনি নতুন গবেষণার মাধ্যমে সেই অসঙ্গতিগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন।

যে প্রেষণা থেকেই গবেষক উদ্বুদ্ধ হোন না কেন, যখন গবেষণার একটি সাধারণ প্রসঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন সেই সাধারণ প্রসঙ্গ থেকে সুস্পষ্ট ও সুতীক্ষ্নভাবে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যাকে চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি করতে গিয়ে, গবেষক নির্বাচিত গবেষণা প্রসঙ্গটি নিয়ে এ বিষয়ে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে পারেন। এ সকল ব্যক্তি গবেষককে গবেষণা

প্রসঙ্গের সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সাহায্য করতে পারেন। সাধারণ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে পূর্বে পরিচালিত গবেষণা, বা রচিত গ্রন্থ পর্যালোচনাকে সুনির্দিষ্ট গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ ধরণের পর্যালোচনা গবেষণার সাধারণ প্রসঙ্গটির মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে কি কি অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। পূর্ববর্তী গবেষকদের দ্বারা অসম্পূর্ণ এই সব বিষয়কে গবেষণা সমস্যায় রূপান্তর করা হয়। এই সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান গবেষণার মধ্যেকার ফাঁকগুলোর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করার মাধমে সেই প্রসঙ্গের উপর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। যদি একটি গবেষণাযোগ্য সমস্যাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে সমস্যার সুনির্দিষ্টকরণ স্বাভাবিকভাবে গবেষণার বর্ণনা, উদ্দেশ্য, অনুকল্প নির্মাণ, প্রধান চলকগুলোর সংজ্ঞা ও সেগুলোর পরিমাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যদি একটি গবেষণাযোগ্য সমস্যাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে সমস্যার সুনির্দিষ্টকরণ স্বাভাবিকভাবে গবেষণার বর্ণনা, উদ্দেশ্য, অনুকল্প নির্মাণ, প্রধান চলকগুলোর সংজ্ঞা ও সেগুলোর পরিমাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গবেষণার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সূত্রবদ্ধকরণের পর বিদ্যমান জ্ঞানের ভিত্তিতে এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। একটি সমস্যাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে, কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর গবেষকের জানা থাকতে হবে। যেমন, সমস্যাটি কি মাত্রায় ঘটে? কত ঘন ঘন এটি ঘটে? কোন অঞ্চলের কি পরিমাণ জনগোষ্ঠী এই সমস্যা দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছে? পূর্বে পরিচালিত গবেষণায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি? সে সকল গবেষণায় কি কি তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত অপ্রতুলতা ছিল? ইত্যাদি। সমস্যাটির উপর বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণার পর্যালোচনা এবং সমস্যাটির উপর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

গবেষণার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সূত্রবদ্ধকরণের পর বিদ্যমান জ্ঞানের ভিত্তিতে এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

সমস্যার বর্ণনা গবেষণা সম্পাদনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য-সম্পাদন করে। *প্রথমতঃ*, এটি একটি গবেষণা প্রস্তাবনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। *দ্বিতীয়তঃ*, গবেষণা প্রসঙ্গটির স্বচ্ছতা, সুস্পষ্টতা ও সুতীক্ষ্ণকরণের মাধ্যমে গবেষণাযোগ্য সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণে সাহায্য করে। *তৃতীয়তঃ*, সমস্যাটিকে সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা, এর গুরুত্ব এবং দেশের বা সমাজের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণে গবেষণা সমস্যার বর্ণনা গবেষককে সাহায্য করে। *চতুর্থতঃ*, কর্তৃপক্ষ বা পৃষ্টপোষকের কাছে উপস্থাপনের জন্য এটি সহজতর করে তোলে। *পঞ্চমতঃ*, বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে কেন গবেষণা করতে হবে তার যৌক্তিকতা প্রদান করে। *ষষ্ঠতঃ*, গবেষণার ফলাফলগুলো কিভাবে উপযোগী হবে তাও বর্ণনা করে।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যাটিকে সংজ্ঞায়িত করার পর সমস্যাটির উপর গবেষণা করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে কি না, সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যাটির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য গবেষককে যে বিষয়গুলোর প্রতি বেশী যত্নবান হতে হবে, সেগুলো হলো:

- সমস্যাটি সমসাময়িক এবং সময়োপযোগী কি না?
- সমস্যাটি যথেষ্ট পরিমাণ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কি না?
- সমস্যাটি বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না?
- সমস্যাটি কোন চলতি কর্মসূচীর সাথে জড়িত কি না?
- পরিকল্পনাবিদরা সমস্যাটি নিয়ে আদৌ ভাবছেন কি না?
- সমস্যাটি সাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলোর সাথে জড়িত কি না? ইত্যাদি।

এ ছাড়াও, প্রস্তাবিত গবেষণাটি পূর্বে পরিচালিত গবেষণা থেকে কতটুকু আলাদা এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তা গবেষককে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। গবেষককে গুরুত্বের সাথে আরও উল্লেখ করতে হবে যে, বিদ্যমান জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সমস্যাটির উপর পরিচালিত গবেষণা কিভাবে এবং কতটুকু অবদান রাখবে? সেটি কি মৌলিক অবদান হবে, না কি সেটি বিদ্যমান জ্ঞানের বিভিন্ন প্রস্তাবনা বা অনুমানকে পরীক্ষা করবে?

সমস্যার বর্ণনা কিভাবে লিখতে হবে (How Should the Statement of the Problem be Written)?

সমস্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পাঠক যেন বিস্তারিত বর্ণনার দ্বারা নিমজ্জিত না হয়ে পড়েন। একটি গবেষণা সমস্যার বর্ণনাকে হতে হবে সূক্ষ্ম এবং সংক্ষিপ্ত। কোন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় যেন বাদ না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, সমস্যাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে। সমস্যার বর্ণনা লেখার পূর্বে প্রধান বিষয়গুলোর একটি রূপরেখা তৈরি করে নেয়া ভালো, যাতে করে বর্ণনাটি সুসংগঠিত এবং যৌক্তিক হয়। সমস্যার বর্ণনা হলো মূলতঃ সমস্যাটির বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে।

প্রথম ধাপে, সমস্যাটিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করতে হবে। কেন না, প্রাসঙ্গিক বিষয়টি অনেক সময় অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই ভিন্নতাগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং পরিকল্পিত গবেষণার মধ্যে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। আমরা জানি যে, সমস্যার অস্তিত্ব তখনই প্রমাণিত হবে, যখন বাস্তবে যা রয়েছে এবং বিষয়টি যা হওয়া উচিৎ, এ দু'টি অবস্থার মধ্যে একটি বৈষম্য প্রতিভাত হবে। অতএব, সমস্যাটি এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে, যাতে করে সেই বৈষম্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ধাপে, সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ, সমস্যার প্রকৃতি বর্ণনায় সমস্যাটি যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্যাটিকে গবেষক যেভাবে দেখছেন এর মধ্যেকার বৈষম্যটিকে বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে। সমস্যাটি কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে, কখন, কোথায় এবং কিভাবে সমস্যাটি ঘটে, তার বিন্যাসটি বর্ণনা করতে হবে। সমস্যাটি কতটুকু বিস্তৃত, কতটুকু তীব্র, এর ফলে কি ফলাফল হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলো এ পর্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে।

তৃতীয় ধাপে, মূল সমস্যাটিকে বর্ণনা করার পর সমস্যাটিকে কি কি উপাদান প্রভাবিত করে তার বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ, কি কি কারণে সমস্যাটির উদ্ভব ঘটে, তা চিহ্নিত করতে হবে। শুধু চিহ্নিত করলেই হবে না। সেই উপাদানগুলোর সাথে সম্যসাটির কি সম্পর্ক রয়েছে, তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সেই উপাদানগুলো সরাসরি প্রভাবিত করে, না কি অন্য কোন উপাদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করে, সেই সম্পর্কগুলোকেও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।

এই তিনটি ধাপ সম্পন্ন করতে হলে, সমস্যাটির উপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, পূর্বে পরিচালিত গবেষণা, প্রকাশিত নিবন্ধ, অপ্রকাশিত প্রতিবেদন, দলিল-পত্র, অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত, গোষ্ঠী, বা প্রতিষ্ঠানকে পর্যালোচনা করতে হবে।

সমস্যার উপর বিদ্যমান তত্ত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানের পর্যালোচনা (Review of Theory, Research and Existing Knowledge on the Problem)

প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনে, বিশেষ করে অভিসন্দর্ভে (thesis), গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনা (review of research literature) উপস্থাপন একটি নৈমিত্তিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণা সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে, এই পর্যালোচনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পুঞ্জীভবন হলো, একদল গবেষকের কাজের উপর আরেকদল গবেষকের কাজের ক্রমসঞ্চিত যোগফল। এই ক্রমসঞ্চয় ঘটে পূর্বের জ্ঞানকে ধারাবাহিক পরম্পরায় চ্যালেঞ্জ করে নতুন জ্ঞান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব নির্মিত হয়, যা গবেষণার উল্লম্ফনস্থল (taking-off point) হিসাবে কাজ করে। এ সকল তত্ত্বের পর্যালোচনা বিভিন্নভাবে গবেষণাযোগ্য সমস্যার জন্য বিভিন্ন ধারণার জন্ম দিতে সাহায্য করে।

যেমন, একজন গবেষক সরাসরি একটি তত্ত্ব, বা তত্ত্বের অধীনস্ত কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা (proposition), বা তত্ত্ব থেকে আহরিত প্রস্তাবনাকে পরীক্ষার জন্য আগ্রহী হতে পারেন। এ সকল তত্ত্ব থেকে একজন গবেষক তার আগ্রহের কোন প্রক্রিয়া বা আচরণকে উপলব্ধির জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গির নিদের্শনা পেতে পারেন। এ সকল তত্ত্ব বৃহৎ পরিমাণে সংগৃহীত উপাত্তকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করতে পারে, যা অন্য কোন নিয়মের মাধ্যমে সমন্বয় করা সম্ভব না বলে গবেষক মনে করেন।

যে প্রসঙ্গটির উপর গবেষণার জন্য গবেষক আগ্রহী হয়েছেন এবং গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছেন, সেই নির্বাচিত প্রসঙ্গটির উপর পূর্বে পরিচালিত গবেষণাগুলোর পর্যালোচনা গবেষণা সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে।

যে প্রসঙ্গটির উপর গবেষণার জন্য গবেষক আগ্রহী হয়েছেন এবং গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছেন, সেই নির্বাচিত প্রসঙ্গটির উপর পূর্বে পরিচালিত গবেষণাগুলোর পর্যালোচনা গবেষণা সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন, পূর্বে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বা ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। পূর্বে পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলোকে শুদ্ধিকরণের উদ্যোগ হিসাবে গবেষক একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। পূর্বে পরিচালিত গবেষণার পুনরাবৃত্তি করে সেই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো আবারও পাওয়া যায় কি না, এটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য গবেষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। পূর্বের গবেষণাকে সম্প্রসারিত করে নতুন প্রপঞ্চ ব্যাখ্যায় ব্যবহার করার জন্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। পূর্বের গবেষণায় প্রাপ্ত অপ্রত্যাশিত ফলাফলগুলোকে বা ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেও একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলগুলো অন্য গবেষণায় প্রয়োগ করা যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য গবেষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। এমন কি পূর্বে পরিচালিত দু'টি প্রসঙ্গের উপর পরিচালিত গবেষণাকে যুক্ত করে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেবার জন্যেও গবেষক একটি গবেষণা করতে পারেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনা শুধুমাত্র প্রতিবেদনে উপস্থাপনের জন্য একটি নৈমিত্তিক বিষয় নয়। এটি গবেষকের চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Research)

গবেষণার সমস্যা নির্বাচন, সূত্রবদ্ধকরণ বর্ণনা ও যৌক্তিকতার পরবর্তী ধাপটি হলো, গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ।

গবেষণার সমস্যা নির্বাচন, সূত্রবদ্ধকরণ বর্ণনা ও যৌক্তিকতার পরবর্তী ধাপটি হলো, গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ। এ বিষয়ে আলোচনার গভীরে যাবার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছু পদ্ধতিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণের পূর্বে অনুকল্প নির্মাণ করা প্রয়োজন। যুক্তিটি হলো যে, সমস্যার বর্ণনায় যেহেতু গবেষণা সমস্যার মধ্যেকার বিভিন্ন প্রত্যয়ের সম্পর্কগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হয়, সেহেতু সে সকল সম্পর্কের সূত্র ধরে অনুকল্প নির্মাণ না করলে গবেষণার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করা যাবে না। আবার কিছু পদ্ধতিবিজ্ঞানী ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও বিষয়টি অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেবার মত হলো। কারণ, গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনার পর গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, গবেষণাটি কি বর্ণনামূলক হবে, না কি ব্যাখ্যামূলক হবে? যদি গবেষণাটি বর্ণনামূলক হয়, তবে সে গবেষণায় অনুকল্প পরীক্ষা করা হয় না। বরং গবেষণা শেষে প্রাপ্ত সম্পর্কসমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য কিছু অনুকল্প নির্মাণ করতে হয়। যদি গবেষণাটি ব্যাখ্যামূলক হয়, সে ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখার জন্য কতগুলো অনুকল্প নির্মাণ করতে হয়। প্রশ্ন হলো, সেগুলো কি উদ্দেশ্য নির্ধারণের পূর্বে হবে, না কি তার পরে হবে?

ভিন্ন মতাবলম্বী পদ্ধতিবিজ্ঞানীদের মতে, অনুকল্প নির্মাণের জন্য গবেষণা সমস্যার মধ্যেকার প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত চলকগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর কার্যকর সংজ্ঞায়ন করতে হবে। যদি চলকগুলোর একাধিক সূচক থাকে, সে ক্ষেত্রে সেগুলোও চিহ্নিত করে কার্যকর সংজ্ঞায়ন করতে হবে। কার্যকর সংজ্ঞায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিমাপের এককগুলো পাওয়া সম্ভব। একটি চলকের যতটি সূচক থাকবে ততটি অনুকল্প নির্মিত হবে। এ সকল কর্মকান্ড পরিমাপ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। অতএব, পরিমাপ প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হবার পূর্বে অনুকল্প নির্মাণ পদ্ধতিগতভাবে যৌক্তিক নয়। শুধু তাই নয়, গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণের সাথে অনুকল্প নির্মাণের চেয়ে গবেষণার প্রকৃতি কি হবে, তা বেশী

সম্পর্কযুক্ত। এ বিতর্কে না জড়িয়ে এটুকু বলা যায় যে, যেহেতু গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণের পূর্বে গবেষণার প্রকৃতি কি হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু আমরা অনুকল্প নির্মাণের প্রক্রিয়াটি গবেষণা প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে আলোচনা করবো।

গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণের মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পটিকে সুনির্দিষ্টকরণের চূড়ান্ত কাজটি সম্পাদন করা হয়। যেমন, যদি গবেষণার বিষয়বস্তুটি শিশুদের বিকাশে দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত হয়, তবে গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতার উপর পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি গবেষণাটি বর্ণনামূলক হয়, তবে গবেষণার উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করতে হবে।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি হলো:

- পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের দক্ষতা অর্জনের রূপ পর্যবেক্ষণ করা।

অর্থাৎ, এই গবেষণার অভিপ্রায়টি হলো শিশুরা তাদের বিকাশে কিভাবে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বেড়ে ওঠার দক্ষতা অর্জন করে তার বর্ণনা করা। গবেষণা শেষে হয়তো গবেষক বিভিন্ন আচরণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কিছু অনুকল্প নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য একাধিক হতে পারে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি বয়স্ক মানুষের সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা হয়, তবে গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারে।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে কি পরিমাণ বয়স্ক মানুষকে সেবা প্রদান করা প্রয়োজন, তার সংখ্যা নির্ধারণ করা;
- বয়স্ক মানুষদের সেবা সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা; এবং
- বয়স্ক মানুষদের সেবা প্রদানের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা।

এ ক্ষেত্রে গবেষণার মূল লক্ষ্যটি হলো, একটি বিশেষ বয়গোষ্ঠীর জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে নির্ণয় করা, কোন সম্পর্কের পরীক্ষা বা কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা নয়।

গবেষণাটি যদি ব্যাখ্যামূলক হয়, সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেমন, যদি শিশুদের বিকাশে দক্ষতা অর্জনের রূপ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কি কি উপাদান দক্ষতা অর্জনে পার্থক্য সৃষ্টি করে, বা দক্ষতা অর্জনের পার্থক্যকে প্রভাবিত করে, তবে গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপে বর্ণিত হবে।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের বিকাশে দক্ষতা অর্জনের রূপ পর্যবেক্ষণ করা;
- দক্ষতা অর্জনে কি কি পার্থক্য রয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করা; এবং
- পার্থক্য সৃষ্টিতে কি কি উপাদান প্রভাব ফেলে, তা নির্ধারণ করা।

একটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সমস্যা থেকে যৌক্তিকভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো উদ্ভূত হওয়া উচিৎ। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো গবেষণার প্রত্যাশিত অবদানগুলোকে বর্ণনা করে। গবেষণা প্রক্রিয়ায় কি কি চলককে পরিমাপ করতে হবে, গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো তার তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত প্রদান করে। গবেষণার উদ্দেশ্যকে দু'ভাবে চিহ্নিত করা হয় – চূড়ান্ত ও তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দীর্ঘ পরিসরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার

ফলাফলগুলো কি অবদান রাখতে পারে সেগুলোকে বিবেচনা করে। যেমন, অপরাধ সংক্রান্ত গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো অপরাধের মাত্রাকে হ্রাস করা।

অন্যদিকে, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের বক্তব্যগুলো মূল চলকগুলোকে নির্দেশ করে এবং কি উদ্দেশ্যে, কখন এবং কোথায় গবেষক কি কি সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন, তার অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। যেমন, শিশু মৃত্যু সংক্রান্ত গবেষণায় গবেষক তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি এভাবে নির্ধারণ করবেন যে, তিনি শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী আর্থ-সামাজিক ও কর্মসূচীভিত্তিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার জন্য একটি নির্ধারিত সংখ্যক নমুনার উপর গবেষণাটি পরিচালনা করবেন।

সারাংশ

এই পাঠে, আমরা তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। বিষয়গুলো হলো: গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণে যৌক্তিকতার ভূমিকা, সমস্যার বর্ণনা লিখনের ধরণ এবং সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানের পর্যালোচনা। আমরা দেখেছি যে, সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রথমেই আমাদের জানতে হয়, সমস্যাটি কিভাবে নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে তিনটি শর্ত – বিদ্যমান জ্ঞান, বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে পার্থক্য এবং এর যথাযথ ব্যাখ্যা – পূরণ সাপেক্ষে একটি গবেষণা প্রসঙ্গ সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে তা পূরণ করেছে কি না। সমস্যার বর্ণনা কিভাবে লিখতে হয় আমরা তাও আলোচনা করেছি। পরিশেষে, সমস্যার মূল উদ্দেশ্য কিভাবে তৈরি হয় এবং উদ্দেশ্যের আলোকে একজন গবেষক পরবর্তী পর্যায়ে কোন ধরণের পদক্ষেপ নেবেন, তা আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। সমস্যাকে তখনই গবেষণাযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে, যখন সেটি _____ শর্ত পূরণ করবে।

ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

২। গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে:

ক. পূর্ব-গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা
খ. গ্রন্থ পর্যালোচনা
গ. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা
ঘ. উপরের সব।

৩। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পুঞ্জীভবন হচ্ছে:

ক. দু'জন গবেষকের প্রাপ্ত তথ্যের যোগফল
খ. গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা
গ. একজন গবেষকের কাজের উপর আরেকদল গবেষকের কাজের ক্রমসঞ্চিত যোগফল
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা সমস্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন কোন ধাপ অনুসরণ করতে হয়?

২। গবেষণা সমস্যা নির্ধারণে গবেষণা পর্যালোচনার গুরুত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। গবেষণা সমস্যাকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।